বিজ্ঞান প্রচারক ঃ
মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ,
পত্রিকা প্রকাশ,
সচেতনা বৃদ্ধিতে পতঙ্গ
কথা : জেনে রাখা ভাল

বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩। কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা-৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬

বর্ষ-৯ | সংখ্যা - ৬ | নভেম্বর-ডিসেম্বর /২০১২ | RNI No. WBBEN/03/11192 | মূল্য : ২ টাকা

অপ্রকৃতি পাঠ

প্লাস্টিক। যার ক্ষয় নেই। পৃথিবীর আবর্জনার ভান্ডার। উপরের ছবিটিতে অবোধ কাঠবিড়ালী তাকে খেতে চেষ্টা করছে। নীচের ছবিতে নিউআলিপুরের সুরুচি সংঘের পূজামন্ডপে প্লাস্টিকের বিপদকে দেখানো হয়েছে। মৃত হাভরের পেটে প্লাস্টিকের অংশ দেখা যাচ্ছে। ছবিঃ তাপস মজুমদার

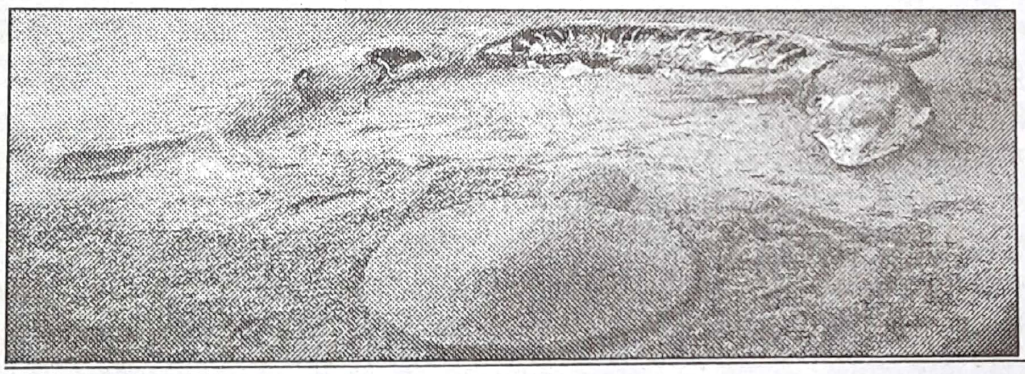

স্পোর্টস মেডিসিন

গত সংখ্যার পর

প্রতিরোধমূলক দিকগুলি ঃ- খেলায় যোগদানের সময় অনেক সময় খেলোয়াড়দের আঘাত লাগে এবং এই আঘাত বা চোট শারীরিক সক্ষমতা বেশী থাকলে সহজে হয় না। কোচ বা ট্রেনাররা লক্ষ্য করেছেন যে, শারীরিক সক্ষমতা কম থাকলে খেলায় আঘাত লাগার প্রবনতা বাড়ে। স্নায়ু পেশীর দূর্বল সমন্বয়, পেশী শক্তির অভাব, দূর্বল লিগামেন্ট এবং কম নমনীয়তা—এগুলি বিশেষ করে খেলোয়াড়দের আঘাতের কারণ

এরপর 3 পাতায়

পিঁপড়ের নানা কথা

গত সংখ্যার পর

পিঁপড়ের বুদ্ধি

ছোট্ট দেহ। মাথাটা আরও ছোট্ট। কতটুকুই বা বুদ্ধি থাকতে পারে এটুকু মাথায় ? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ক্ষুদে পিঁপড়ের ক্ষুদে মাথার বুদ্ধি দেখে অবাক হতে হয়। একটি বড়সড় কেঁচোকে ঘায়েল করার পর তাকে বাসার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। হাজার হাজার পিঁপড়ে মিলেও ওটাকে টানতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তাই কেঁচোর দেহের ওজন কমানোর জন্য এরা শুকনো মাটির ঢ্যালা কেঁচোটির দেহে ছড়িয়ে দেয়। মাটির ঢ্যালা কেঁচোটির দেহে অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ শুষে নিয়ে ওজন কমিয়ে দেয়। ফলে কেঁচোটিকে টেনে নিয়ে যেতে অনেক সুবিধা হয়।

এরপর 2 পাতায়

ডায়াবেটিস মেলাইটাস : এই প্রাচীন রোগটিতে নবীন প্রজন্মও আক্রান্ত

ভারতে ডায়াবেটিস রোগটি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইদানিং স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে উদ্বেগজনক ভাবে রোগটির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাই এই ডায়াবেটিস রোগটি সম্বন্ধে সকলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

ডায়াবেটিস বা মধুমেহ রোগটি বহু প্রাচীন। আয়ুর্বেদে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের দুই চিকিৎসক সুশ্রুত (৪০০ খৃঃ পূঃ) ও চরক (২০০ খৃঃ পূঃ) জানতেন এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মূত্রের পরিমান অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায় ও মূত্রের স্বাদ মিষ্ট হয় ও রোগী ক্রমশ রোগা হতে থাকে। গ্রীক চিকিৎসক

এরপর 4 পাতায়

পিঁপড়ের নানা কথা

1 পাতার পর

পিঁপড়ে কি খায়?

পৃথিবীতে পিঁপড়ে এসেছে ৮ কোটি বছরেরও আগে। তখন মানুষ কোথায়? বরং বলা যায় সময়ের হিসাবে মানুষ ওদের কাছে শিশু। অতএব ধরে নেওয়া যায় পৃথিবী তখন ছিল জলা- জঙ্গলে ঠাসা। পিঁপড়ের দল ঘুরে বেড়াত এসব জঙ্গলে, পাহাড়ের খাঁজে এবং জলাভূমির আশেপাশে। উদ্দেশ্য শিকার ধরা। শিকার আকারে বড় হলেও এই ক্ষুদে প্রাণীগুলোর সঙ্গে যুদ্ধে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারে না। দল বেঁধে চারিদিক ঘিরে ফেলে শিকারের দফারফা করে ছাড়ে এসব ছোটো ছোটো প্রাণীদের মাংস এদের প্রিয় খাদ্য।

মানুষ আসার পর পৃথিবীর পরিবেশ অনেকটাই পাল্টে যায়। বন-বাদাড় সাফসুফো হয়ে ইট, বালি পাথরের বড়বড় ইমারত তৈরি হতে থাকে। পত্তন হয় বড়বড় শহরের। ক্রমশ জঙ্গল ছোট হতে থাকে, জলাভূমির আয়তন কমতে থাকে, শহরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পিঁপড়েরা পড়ল মহা সমস্যায়। বন জঙ্গলে থাকার এতদিনের অভ্যাস পাল্টে শহরবাসী হবে কিভাবে? মানুষ ভাবল এবার ব্যাটাদের জব্দ করা গেছে। বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর সময় হাত-পা কামড়ে ফুলিয়ে দিত। উঃ সে কি সাংঘাতিক জ্বালা?

কয়েক দিন যেতে না যেতেই মানুষ বিস্ময় হতবাক। তাদের সমস্ত হিসেব নিকেশ ওলোটপালট করে দিয়ে কাতারে কাতারে পিঁপড়ে শহরে ঢুকে পড়ল। নতুন পরিবেশ দিব্বি মানিয়ে নিয়ে বাড়ির আনাচে কানাচে দেওয়ালের ফাঁটলে ইত্যাদি নানা জায়গায় নিজেদের নতুন আস্তানা তৈরি করে নিল। চলার পথ তৈরি করে নিল দেওয়ালের ধার ঘেঁষে। কিন্তু খাবার? লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ের খাবারের জোগান দেওয়া কি ভাবে হবে? খাবারের অভ্যাস পাল্টে ফেলে সে সমস্যাটা সমাধান করে ফেলল বিচ্ছুগুলো। মানুষের খাবারে ভাগ বসাল সে রান্না করাই হোক, আর কাঁচাই হোক। তবে মাছ আর মিষ্টির প্রতি এদের লোভটা একটু বেশি। মাছ পেলে তো কথাই নেই। চেটেপুটে সাবার করে দেবে। মিষ্টির ক্ষেত্রে কিন্তু এরা একটু সাবধানী। মিষ্টিতে যদি ভেজাল না থাকে তবে পেটপুরে খেয়ে বাকীটা টুকরো টুকরো করে মুখে নিয়ে বাসার দিকে রওনা দেবে। আর যদি ভেজাল থাকে তবে সারবস্তুটুকু খেয়ে ভেজাল অংশটা ফেলে দিয়ে চলে যাবে।

পিঁপড়ের বাগান

ফল ফুলের গাছপালা লাগিয়ে বাগান করা তো মানুষের কাজ। পিঁপড়েরা বাগান করে এমন তো কখনও শুনিনি? আর তাছাড়া ওরা গাছপালা লাগাবে কি করে? যত্ত সব ভোগাস কথাবার্তা। উঁহু এত তাড়াতাড়ি দাড়ি টেনে দিলে চলবে না। আমাজনের জঙ্গলে এক জাতের পিঁপড়ে আছে যারা সত্যিই বাগান করে। তবে এদের বাগান করার ধরণটা অদ্ভুত। মানুষ যেখানে নতুন নতুন গাছ লাগিয়ে বাগান করে এরা সেখানে গাছ কেটে বাগান করে। এদের বাগানে অবশ্য নানা ধরনের গাছ পাওয়া যায় না। কেবল 'লেমন অ্যান্ট' নামে এক ধরণের গাছই যেখানে থাকে। পিঁপড়েগুলো এদের এই নির্দিষ্ট এলাকায় এই গাছ ছাড়া অন্য কোনও গাছ জন্মাতেই দেয় না। অন্য কোনও গাছের চারা মাথা তুললেই সঙ্গে সঙ্গে এরা ফরমিক অ্যাসিড ছিটিয়ে সেটাকে মেরে ফেলে। তাই পিঁপড়ের বাগানে লেমন অ্যান্ট গাছ ছাড়া আর কোনও গাছ দেখতে পাওয়া যায় না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এই প্রজাতির পিঁপড়েরা একমাত্র লেমন অ্যান্ট গাছেই বাসা বাঁধে।

আমাজনের জঙ্গলে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে পুরানো যে বাগানটির খোঁজ পাওয়া গেছে তার বয়স আটশ বছরেরও বেশি। এক হাজার তিনশ বর্গমিটার আয়তনের এই বাগানে প্রায় পনেরো হাজার রানী নিয়ে ত্রিশ লক্ষেরও বেশি পিঁপড়ে বাস করে।

স্থানীয় আদিবাসীরা এই বাগানকে বলে 'শয়তানের বাগান'। তাদের বিশ্বাস চুয়াচাকি নামে এক দুষ্ট আত্মা একটু একটু করে এই বাগান তৈরি করে। চুয়াচাকি দেখতে বামনের মত। একটা পা মানুষের মত হলেও আরেকটা পায়ে আঙুলের বদলে ঘোড়া বা গরুর খুর থাকে। ধূমকেতুর মত হঠাৎ করে একে দেখা যায় আবার পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করছে এমন দেখতে পেলেই বন্ধু সেজে তার সঙ্গ নেয়। তারপর নানা ভাবে ভুলিয়ে তাকে জঙ্গলের গভীরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে চুয়াচাকি উধাও হয়ে যায়। গভীর জঙ্গল থেকে পথ চিনে মানুষটি আর বের হতে পারে না। চিরকালের মত হারিয়ে যায়।

স্থানীয় উপজাতিদের গল্প যাই হোক না কেন বিজ্ঞানী ফেব্রিকস বলেছেন, চুয়াচাকি বা শয়তানের বাগান আসলে বিশেষ এক জাতের পিঁপড়ের বাগান।

পিঁপড়েদের সামাজিক জীবন

পিঁপড়েদের সমাজ স্ত্রী শাসিত। বন্ধ্যা স্ত্রী পিঁপড়েদের হাতেই থাকে সমাজ পরিচালনার ভার। এমনকি ডিম ফুটে পিঁপড়ের জন্মের সময় লিঙ্গ নির্ধারণও এরা নিজেরাই করে। সমাজের কর্তৃত্ব যাতে বন্ধ্যা স্ত্রী পিঁপড়েদের হাতে থাকে তাই তাদের সংখ্যাই এরা ক্রমাগত বাড়িয়ে যায়। তুলনায় রানী ও পুরুষের সংখ্যা খুবই কম রাখা হয়। ইচ্ছে মত শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ পিঁপড়েরা পারে কিন্তু বুদ্ধিতে সেরা হয়েও মানুষ পারে না। এখানেই পিঁপড়েদের কাছে মানুষের পরাজয়। পিঁপড়েদের সমাজে রানি পিঁপড়েরা নামেই রানি। সন্তান উৎপাদন ছাড়া আর কোনও ভূমিকায় তাদের পাওয়া যায় না। বলা যেতে পারে আর কোনও ক্ষমতাই তাদের দেওয়া হয় না। পুরুষ পিঁপড়েদের অবস্থা আরও করুন। সন্তান উৎপাদনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই কাজে লাগানো হয়। তারপর অনেক ক্ষেত্রে তাদের বেঁচে থাকারও অধিকার থাকে না।

নতুন প্রজন্মের পিঁপড়েদের প্রতি এদের গভীর ভালবাসা লক্ষনীয় ডিম, পিউপা, লার্ভা ইত্যাদির যাতে কোনও রকম ক্ষতি না হয় তার জন্য এরা নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তাদের যাতে কোনওরকম

এরপর ৪ পাতায়

স্পোর্টস মেডিসিন

1 পাতার পর

হয়। অপর্যাপ্ত সুষম খাদ্যগ্রহণ এবং মানসিক প্রস্তুতির অভাবও তাদের আঘাতের কারণ হতে পারে। এর জন্য প্রত্যেক খেলোয়াড়কে কন্ডিশনিং ব্যায়াম করা দরকার।

স্পোর্টস কন্ডিশনিংয়ে দশটি প্রধান নীতি অনুসরণ করা হয়। এগুলিহল ঃ—

১) ওর্য়ামিং আপ ঃ খেলার অংশগ্রহণ করার আগেই গা গরম করার জন্য দৌড়ানো, লাফানো, দেহ সন্ধিগুলির সঞ্চালন সংক্রান্ত ব্যায়ামগুলি করে নিলে আঘাত লাগার প্রবনতা কমে যায় এবং খেলার জন্য খেলোয়াড়কে মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে দেয়।

২) ক্রম ঃ প্রত্যেক দিন কন্ডিশনিং ব্যায়াম মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ানো দরকার। সর্বোচ্চ শারীরিক সক্ষমতা পেতে হলে প্রায় আট সপ্তাহ সময় লাগে।

৩) টিমিং ঃ ব্যায়ামের সময় (এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা) যেন সীমাবদ্ধ থাকে। এটা খেলার প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে। মনে রাখতে হবে ক্লান্ত খেলোয়াড়দের আঘাত পাওয়ার প্রবনতা বেশী।

৪) প্রাবল্য ঃ ব্যায়ামের পরিমাণের চেয়ে ব্যায়ামের প্রাবল্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ যতই দিন যাবে প্রাবল্য সেই অনুপাতে বাড়বে।

৫) ধারণ ক্ষমতা ঃ প্রত্যেকের শারীরবৃত্তিয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে এবং ইহা প্রত্যেকের সমান হয় না। এই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়ে ট্রেনিংয়ে ব্যায়ামের পরিমান বা প্রাবল্য ঠিক করা উচিত।

৬) শক্তি ঃ এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে খেলা বা গতির জন্য মাংসপেশীর শক্তি বাড়ানো দরকার।

৭) প্রেষণা ঃ ব্যায়াম সম্পূর্ণ করার জন্য যে মানসিকতার দরকার তা শক্তিশালী করতে সারকিট ট্রেনিং জাতীয় ট্রেনিং দরকার।

৮) বিশেষীকরণ ঃ বিশেষ খেলার জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ ধরণের ব্যয়াম করা দরকার।

৯) শৈথিল্যকরণ ঃ শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্য বিশেষ ধরণের রিলাক্সেশন ব্যায়াম করা দরকার। মূল ব্যায়ামের পর এই ব্যায়ামগুলি করা হয়।

১০) রুটিন ঃ ব্যায়ামের সুফল লাভ করার জন্য ব্যায়ামের নির্দিষ্ট তালিকা করা দরকার। প্রতিযোগিতার সময় বা বছরে যখন প্রতিযোগিতা হবে না তখন কি কি ধরণের ব্যায়াম করা হবে তার নির্দিষ্ট তালিকা থাকা আবশ্যক।

১১) আরোগ্য ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের দিকগুলি ঃ অসুস্থ বা আহত খেলোয়াড়দের ফিজিক্যাল থেরাপি করার জন্য তাপ, আলো, জল, বিদ্যুৎ, ম্যাসাজ, ব্যায়াম এবং বিকিরণ ব্যবহার করা হয়। যেগুলি সহজে প্রয়োগ করা যায়, সেগুলি হল ঃ—

1. Mechanical therapy ম্যাসাজ ও Mobilization techniques. 2. Cryotherapy. 3. Superficial thermo therapy. 4. Penitrating therapy.

১। ম্যাসাজ ঃ সঠিক পদ্ধতিতে দেহের চামড়ার নীচের কোষগুচ্ছের শুশ্রূষাকে ম্যাসাজ বলে। ইহা হাত বা যন্ত্রের সাহায্যে করা যায়। ত্বকের উপরের কোষের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেই জন্য ম্যাসাজ করার আগে দেহের উপর পাউডার বা তেল লাগানো হয়। ম্যাসাজ মাংসপেশী শিথিল করে ক্লান্তি দূর করে, সন্ধিস্থলের নমনীয়তা বাড়ায় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যে, ম্যাসাজ করলে স্বাভাবিক ভাবে ব্যথা-বেদনা দূর হয়, এছাড়াও মানসিক দুঃশ্চিন্তা—বিষাদ দূরকরে।

২। শৈত্য চিকিৎসা ঃ আহত স্থানকে ঠান্ডা করার জন্য বরফ দ্বারা ম্যাসাজ, বা গোল্ড প্যাক, ঠান্ডা জলের ধারা, ঠান্ডা স্প্রে করা হয়। সাধারণতঃ আঘাত লাগার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এই চিকিৎসা করা হয়।

ঠান্ডার জন্য রক্তবাহী নালী বা জালিকার নালীগুলির সংকোচন হয়, ফলে রক্ত বা রক্ত রসের ক্ষরণ কম হয় আহতস্থান কম ফুলে ওঠে ও যন্ত্রণা কম হয়।

৪। তাপ চিকিৎসা ঃ ৪৮ ঘন্টা পর আহত স্থানে তাপের প্রয়োগ করলে আরোগ্য দ্রুত হয়। তাপ প্রয়োগে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে, শিরায় রক্ত পরিবহন বাড়ায়, কোষ মধ্যস্থিত বর্জ্য অংশ সহজে বার করে দেয় ফলে আরোগ্য দ্রুত হয়।

Moist hot packs, Immerson bath, contrast bath, purffin bath, infrared therapy উল্লেখযোগ্য। এছাড়া diathermy (therapeutic application of high frequency electrical current), ultra sound diathermy ব্যবহার করা হয়।

৫। যন্ত্রণা উপশম করার জন্য আহত স্থানে ব্যথা নাশক স্প্রে বা মলমও প্রয়োগ করা হয়।

পরিশেষে বলতে চাই যে, 'Sports Medicine' এর বিভিন্ন দিকগুলি চিন্তা করলে এর আক্ষরিক মানে ঠিক হয় না বরং একে স্পোর্টস সায়েন্স বললে ঠিক হত। বিজ্ঞানের প্রয়োগে মানুষের শুভ-অশুভ দুটোই হতে পারে। কি ভাবে মানুষ বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করবে তার উপর নির্ভর করবে ভবিষ্যতের ভাল বা মন্দ। জৈব প্রযুক্তির দ্বারা সুমো কুস্তিগীর তৈরী করা হয়। মেয়ে কুস্তিগীরদের পুরুষ হরমোন প্রয়োগে যে ধরণের পেশী বহুল শারীরিক গঠন প্রদর্শিত হয় তা মেয়েদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের হানিকর। ক্রীড়া বিজ্ঞানের স্পোর্টস মেডিসিনের সাহায্যে কৃত্রিম ভাবে খেলোয়াড়দের নৈপুন্য বাড়ানোর প্রবনতা কতটা মঙ্গলজনক তা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু এটা ঠিক এর প্রভাবে ক্রীড়াজগত ক্রমশঃ যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে। এই যান্ত্রিকতা খেলার মূল্যবোধকে নষ্ট করে দেয়। প্রতিযোগিতায় যতটা সম্ভব স্বাভাবিক বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত।

আসুন আমরা কামনা করি খেলার জগতে স্পোর্টস মেডিসিন বা ক্রীড়া বিজ্ঞানের জগতে মানুষের শুভ বুদ্ধির উদয় হোক— প্রযুক্তির শুভ প্রয়োগ ঘটুক এবং মানুষের খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের শুভ বিকাশ ঘটুক।

— লেখক ঃ ড. নন্দদুলাল সেনগুপ্ত, মোঃ ৯৪৩৩১৬৪১৬৭
শ্যামনগর, কান্তি চন্দ্র হাইস্কুল (উঃমাঃ)

ডায়াবেটিস মেলাইটাস

1 পাতার পর

অরিতিয়াস (৩০-৯০ খৃঃ) এই রোগটির নামকরণ করেন 'ডায়াবেটিস' যার অর্থ বেরিয়ে যাওয়া বা প্রবহিত হওয়া। তিনি শস্যকনা, শ্বেতসার, শরতের ফল ও মিষ্ট সুরা গ্রহণের পরামর্শ দেন। এর বহু বছর পরে, উইলিস (১৬৭৫ খৃঃ) পশ্চিম দুনিয়াকে জানান মূত্রে শর্করার উপস্থিতির কথা। অত্যাধিক সুরা পানকে এর কারণ হিসাবে ধরা হয়। তিনিই প্রথম খাদ্যে কার্বহাইড্রেট নিয়ন্ত্রণ করে এর চিকিৎসা করেন। লন্ডনের এই চিকিৎসক ডায়াবেটিসের সঙ্গে 'মেলাইটাস' শব্দটি যোগ করেন, যার মানে 'মধুর মত'।

ডবসন (১৭৭৬) প্রথম পরীক্ষা করে জানান রক্তে ও মূত্রে গ্লুকোজের উপস্থিতির কথা। এর ফলে জানা যায় ডায়াবেটিস মেলাইটাস রোগটি শর্করার বিপাকজনিত ত্রুটির জন্য হয়ে থাকে।

এরপর বহু বছর কেটে গিয়েছে। ইনসুলিন নামক হরমোনের অভাবে বহু প্রাণ অকালে চলে গিয়েছে। কিন্তু ১৯২১ সালে ৩০ শে জুলাই ব্যান্টিং ও বেস্ট এর যুগান্তকারী ইনসুলিন আবিষ্কারের ফলে বহু প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। এই ইনসুলিন হরমোন অগ্নাশয়ের বিটা কোষ থেকে নিঃসৃত হয়। ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। কার্বহাইড্রেট জাতীয় খাবার যেমন ভাত, রুটি, সব্জী, ফল, চিনি, মধু, গুড় ইত্যাদি খাওয়ার পর হজম ও শোষিত হয়ে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ায়। ইনসুলিন অগ্নাশয় থেকে নিঃসৃত হয়ে গ্লুকোজকে পেশী ও যকৃতে পৌঁছে দেয়। ও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক রাখে, ফলে দেহে শক্তির যোগান ঠিক মত হয়।

এই কাজে ব্যাঘাত ঘটলে দেহে ডায়াবেটিসের নানা উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি, মূত্রে গ্লুকোজ নিঃসরণ, অতিরিক্ত তৃষ্ণা ও ক্ষুধা বোধ, বার বার প্রস্রাব হওয়া ইত্যাদি। কার্বহাইড্রেট বিপাকের ত্রুটির জন্য অন্য উপাদান যেমন প্রোটিন ও ফ্যাটের ও বিপাক জনিত ত্রুটি দেখা দেয়। এছাড়া ধাতব লবন সোডিয়াম ও পটাশিয়াম ও জলের ভারসাম্য রক্ষা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। বিপাকীয় জটিলতার ফলে দেহে অচিরে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। যেমন উচ্চ রক্ত চাপ, হৃদরোগ, কিডনির কার্যক্ষমতা হ্রাস, স্নায়ুর অসুখ, দৃষ্টি শক্তি হ্রাস বা অন্ধত্ব ইত্যাদি। এছাড়া শরীরে কোথাও ক্ষত হলে তা সহজে সারতে চায় না। ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর হার অন্য রোগের তুলনায় তিনগুন বেশী।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রধানত দু ধরণের ডায়াবেটিস চিহ্নিত করেছে। টাইপ ওয়ান ও টাইপ টু। টাইপ ওয়ানের ক্ষেত্রে বিটাকোষ ইনসুলিন প্রস্তুত করতে পারে না। তাই সারা জীবন ইনসুলিন ইনজেকশনের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। সেই সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ ভাবে খাদ্যকেও নিয়ন্ত্রিত রাখতে হয়। টাইপ ওয়ান ইনসুলিন নির্ভরশীল। তাই এটি ইনসুলিন ডিপেন্টডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাস। টাইপওয়ানকে জুভেনাইল অনসেট ডায়াবেটিসও বলে, এটি অপেক্ষাকৃত কম বয়সে হয়। টাইপ ওয়ানের কারণ জীনগত পরিব্যক্তি, ভাইরাস সংক্রমন, স-অনাক্রম্যতা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় রকমের ডায়াবেটিস হল টাইপ টু বা ইনসুলিনের উপর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ নন ইনসুলিন ডিপেনডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাস। টাইপ টু কে ম্যাচুরিটি অনসেট ডায়াবেটিসও বলে। এই রোগটি সাধারণত মধ্য বয়সে হয়। এক্ষেত্রে ইনসুলিন প্রস্তুত হয় কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম বা কোন উদ্দীপকের অভাবে ইনসুলিনের যথাযথ নিঃসরণ হয় না, কিংবা যথেষ্ট মাত্রায় ইনসুলিন রয়েছে কিন্তু তাদের কাজে বাধা দেওয়ার মত কোন বস্তুর উপস্থিতি। টাইপ টু রোগটির কারণ বংশগতি, পরিবেশের প্রতিকূলতা, অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক চাপ, জন্মের সময়ের ওজন খুব কম বা কখন কখনও স্থূলত্ব। টাইপ টু ডায়াবেটিস রোগীকে সাধারণত ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয় না। ওষুধ এবং / অথবা ক্যলরি ও কার্বহাইড্রেট নিয়ন্ত্রিত খাদ্য গ্রহণ ও ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেকে সুস্থ রাখতে পারেন। তবে এই প্রয়াসটি সারা জীবন চালিয়ে যেতে হয়।

ভারতে শতকরা ৯০ ভাগ ডায়াবেটিস রোগীই টাইপ টু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই রোগ দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে ২০৩০ সালে ভারতে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৮ কোটি। বর্তমানে সংখ্যাটি ৩ কোটি২০ লক্ষেরও বেশী। পৃথিবীর প্রায় ২৩ কোটি মানুষ দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন। ২০৩০ সালে রোগীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৩৫ কোটি। পৃথিবীর ১/৪ ভাগ ডায়াবেটিস রোগী ভারতে বসবাস করছে। এখনই সংখ্যাধিক্যের কারণে ভারত 'বিশ্বের ডায়াবেটিস রাজধানী' এই আখ্যা পেয়েছে।

বর্তমানে বিশেষ করে শহরে এই রোগটি চিন্তা ও আশঙ্কার উদ্রেক করছে। কারণ স্কুল পড়ুয়া টিনএজারদের মধ্যেও ডায়াবেটিস রোগটি বাড়ছে। এরা টাইপ টু'র শিকার। খাদ্যাভাসের আমূল পরিবর্তন, অত্যধিক পড়াশুনার চাপ, অবসরে টিভি দেখা, কায়িক পরিশ্রম বা খেলাধূলার অভাব, দৈহিক ওজন বৃদ্ধি, অত্যধিক ক্যালরীযুক্ত খাবার বা ফাস্টফুড খাওয়া ইত্যাদি অল্প বয়সীদের উপর এই রোগের আগ্রাসন বাড়িয়ে তুলেছে। যে রোগটি মধ্য বয়সে দেখা দেয় সেটি অল্প বয়সে দেখা দিচ্ছে।

খাদ্য তালিকায় ভাত, রুটি, ডাল-যার মধ্যে জটিল শর্করার প্রাধান্য,যথেষ্ট পরিমানে শাক, সব্জী-যার মধ্যে ভিটামিন ধাতব লবন ও ফাইটেকেমিক্যালের সঙ্গে প্রচুর ফাইবার থাকে তা যেন প্রতিদিন থাকে। সেই সঙ্গে কম মিষ্টি ফল যেমন পেয়ারা আপেল ইত্যাদি এরাও প্রচুর ফাইবারের যোগান দেয়। ফাইবার যুক্ত খাবার ও জটিল শর্করা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। দৈহিক পরিশ্রম, ব্যায়াম ও খেলাধূলা পেশীর গ্লুকোজ গ্রহণ ক্ষমতাকে বাড়ায় ও অগ্নাশয়ের বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন নিঃসরণও বাড়ায়। এর ফলে গ্লুকোজ পেশীতে সঞ্চিত হয়ে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমিয়ে সঠিক রাখে। গ্লুকোজের প্রধান গুরুত্ব পূর্ণ কাজ দেহে শক্তির যোগান দেওয়া সেটি অব্যাহত থাকে।

বর্তমানে অল্প বয়সীদের মধ্যে বিশেষ করে শহরে এই রোগের হার উদ্বেগজনক ভাবে বেড়ে চলেছে। জীবনযাপন ও খাদ্যর উপর নিয়ন্ত্রণ হারালে আমরা অচিরেই ভবিষ্যত প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে

এরপর 7 পাতায়

আদর্শ বিজ্ঞান প্রচারকের জীবনব্রতে অবিচল থেকেছেন মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

২৮/০৬/২০১২, রাত ১০টা ৫২ মিনিটে ৯৩ বছর বয়সে অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় প্রসাহ গুহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আগেই স্ত্রী নমিতা গুহ চলে গেছেন (বছর পাঁচেক প্রায়)। তিন পুত্র, নাতি-নাতনি পরিবৃত মৃত্যুঞ্জয়বাবু আদ্যন্ত সাংসারিক হয়েও বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের ঘনিষ্ঠ দায়বদ্ধতায় রেখে গেলেন এক সমৃদ্ধ সৃষ্টি ভান্ডার।

তাঁর প্রথম পরিচয় রসায়ন বিজ্ঞানী। একাধিক সরকারি কলেজে রসায়নের অধ্যাপনার পাশাপাশি গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু গবেষণা পরিমন্ডলের দলাদলি, সঙ্কীর্ণতা এড়াতে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনায় আত্মমগ্ন হয়ে উঠলেন বিজ্ঞান সাহিত্যের আঙিনায়। নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং একান্ত ভালবাসায় তাঁর কাজ, রচিত গ্রন্থাদি ও বিজ্ঞান পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধাদি তাঁকে এনে দিয়েছে নানা সম্মান ও পুরস্কার। না! কখনও থামেন নি।

শেষের বছর দুই (২০১০/১১) তিনি বেশ খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। নানা চিকিৎসা চলে। আবার কিছুদিন আর জি কর হাসপাতালে ও নার্সিংহোমে ভর্তি থেকেছেন। ছোটো পুত্রবধূ মঞ্জুর সেবা যত্নে তৃপ্ত মৃত্যুঞ্জয়বাবু লেখা ও লেখা প্রকাশের চিন্তায় সর্বদাই মগ্ন থেকেছেন। এই সময়কালেও জ্ঞানবিচিত্রা, কালান্তর (প্রকৃতি ও মানুষের পাতায়), জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এযুগের কিশোর বিজ্ঞানী, গণ বিজ্ঞান চেতনা এমন সব বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। নতুন বিজ্ঞান গ্রন্থ নির্মানে তাঁর মগ্নপ্রয়াস অনেকের কাছে প্রেরণা স্বরূপ।

বেশ কাছ থেকেই তাঁকে ৩০ বছর সময়কাল ধরে দেখেছি, চিনেছি, অসংখ্যবার তাঁর বাড়ি গিয়েছি। প্রচুর কথা শুনেছি। আলোচনা হত ২/৩ ঘন্টা ব্যাপী। ওঠার সময়ও বলতেন আর একটু বোস। নিজের জীবন অভিজ্ঞতা বলতেন এভাবে যাতে নতুন প্রজন্ম লড়াই বা পরিশ্রম চালাতে পিছপা না হয়। হেলাফেলায় কখনও কোন কাজ করতেন না। বইয়ের পান্ডুলিপি তৈরিতে আধুনিকতম তথ্য সংগ্রহে তাঁর প্রয়াস দেখেছি খুব কাছ থেকে। বইতে প্রচুর ছবি ব্যবহার করতেন পাঠককে তৃপ্ত করতে। নিজের হাতে ছবিও আঁকতেন প্রচুর, যা তাঁর বই ও প্রবন্ধে প্রকাশিত হত। নতুন প্রজন্মের লোকদের উৎসাহদানে তাঁর উদ্যোগী প্রয়াস দেখেছি খুব কাছ থেকে। আমার কাছে গচ্ছিত তাঁর বহু চিঠি এর প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। শেষ দিকের ইলেকট্রনিক যুগেও হাতে চিঠি লেখায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। বেশি লিখতেন ইনল্যান্ড খামে। অনেক সময় খাম ও পোস্ট কার্ড পেয়েছি অগুনতি। সব চিঠির উত্তর না দেওয়ায় বকুনিও শুনেছি নিয়মিত ভাবে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর সরস সাবলীল গদ্যভঙ্গি। এতসহজ গদ্য লিখতেন বিষয় বস্তুকে লঘু না করে, তা আমাদের আশ্চর্য করে। প্রথম বই— পেট্রোলিয়াম, বিশ্বভারতী, পঞ্চাশ পয়সা, ১৯৫৪ সাল। শেষ বই স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কথা, ৪০৬ পৃষ্ঠা, ২০০ টাকা, ২০১০। এই ৫৬ বছর সময়কালে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৭। ১৯৬৪ সালে তিনি রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন আকাশ ও পৃথিবী গ্রন্থের জন্য। শিশু সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পান ১৯৬৯ সালে 'চল যাই চাঁদের দেশে' গ্রন্থের জন্য। 'সমুদ্রের কথা' বইটি ১৯৯৬ সালে তাঁকে চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট আয়োজিত প্রথম পুরস্কার এনে দেয়।

তাঁর লেখা লিখির সময়কাল কমবেশি ৭৫ বছর প্রায়। প্রথম থেকেই স্কুল পাঠ্য বিজ্ঞান গ্রন্থ (ভৌতবিজ্ঞান) রচনায় তিনি ব্যস্ত থেকেছেন একটি কারণে। এ থেকে লব্ধ অর্থ তিনি অকাতরে ব্যয় করেছেন নিজের জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশে। এই প্রয়াস তাঁর দায়বদ্ধতাকে অন্যমাত্রায় চিহ্নিত করে। 'জীবজগতের বিচিত্র খবর' (জনপ্রিয় বিজ্ঞান কোষ - দুই খন্ড উদ্ভিদ বিজ্ঞান) বড় কলেবরে প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশনায় তাঁর বিপুল আর্থিক ক্ষতি তাঁকে কখনও নিরুৎসাহী করেনি।

সময় নষ্ট কথাটা তাঁর অভিধানে ছিল না। প্রতিদিন নিয়ম করে পড়তেন, লিখতেন। প্রথম জীবনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পরবর্তী সময়কালে নিজের লেখালিখি নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। বাইরের কাজে তাঁর বিশেষ কোনও আগ্রহ দেখিনি। লেখা চেয়ে কেউ কখনও বিফল হয়েছেন এমন একটি নজিরও বোধ হয় পাওয়া যাবে না। প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিজ্ঞান পত্রিকায়ও তাঁর লেখা প্রকাশিত হত।

নিজে রসায়ন বিদ্যায় কৃতবিদ্য হওয়ায় ভৌতবিজ্ঞানের পরিসরে তাঁর রয়েছে একাধিক বই। পাশাপাশি জীবনবিজ্ঞানের সীমানায় তাঁর লেখালিখির পরিসর তুলনায় ব্যাপক। রচিত গ্রন্থের সিংহভাগ উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, জীব বিবর্তন, কীটপতঙ্গ, সাগরপ্রাণী, স্তন্যপ্রাণী, জীবাণু বিজ্ঞান ঘিরে। ছোটো ছেলে শৈবালকুমার গুহকে নিয়ে লিখেছেন একাধিক বই। সুস্থ শরীর, নিশ্চিত পারিবারিক জীবন প্রবাহ তাঁর লেখার কাজকে কখনও ব্যাহত করেনি। তাঁর স্ত্রীকেও দেখেছি তাঁর কাজের সহায়তায় সর্বদা সচেষ্ট থাকতে।

ভরাট গলায়, স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতেন। মতামত প্রকাশে জড়তা দেখিনি। সবচেয়ে খুশী হতেন তাঁর লেখা নিয়ে কোনো পাঠকের চিঠি এলে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেন আন্তরিক মমতা জড়ানো ভাষায়। প্রায় ৫০ বছর কাল থেকেছেন বেলগাছিয়া এলাকায়। ৫/৩এ ওলাই চন্ডী রোড, কলকাতা-৭০০০৩৭। জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ময়মন সিংহ জেলায় নেত্রকোনা গ্রামে। পিতা রজনীকান্ত গুহ, মাতা ইন্দুবালা গুহ। গ্রামবাংলার শ্যামল সবুজ প্রকৃতি ঘেরা সজীব পরিবেশ ছবি তাঁর লেখাতেও বারবার উঠে এসেছে। উদ্ভিদ জগৎ ও জীবজন্তু বিষয়ক একাধিক রচনায়, বিশেষ করে 'কীটপতঙ্গের কথা' বইতে তাঁর গ্রাম জীবনের বহু পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে।

আটপৌরে সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনেই অভ্যস্ত ছিলেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও এক জীবনে এত কাজ গুছিয়ে করা যায় তারএক উজ্জ্বল উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ। বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের মনস্ক

এরপর 6 পাতায়

সচেতনা বৃদ্ধিতে পতঙ্গ কথা : জেনে রাখা ভাল

যে সব প্রাণীর বাইরের দেহাবরণ শক্ত খোলশে ঢাকা এবং পা খন্ডাকারে জোড়া (সন্ধিপদ) তারা আর্থপোডা নামে চিহ্নিত। পৃথিবীর মোট প্রাণী জগতের ৪/৫ ভাগ প্রাণী এই শ্রেণিভুক্ত। ইতিমধ্যে জীববিজ্ঞানীরা ১০ লক্ষের বেশি প্রজাতি সনাক্ত করেছেন এবং আরও কিছু খুঁজে পাবার প্রত্যাশায় অন্বেষণেরত।

মাকড়সা এবং কাঁকড়া বিছে—এরা পতঙ্গ নয়। এদের আছে চার জোড়া পা। এদের শরীর দু'ভাগ বিভক্ত—মাথাও বুক মিলে একটি ও পেট, এদের কোন ডানা নেই, শুঁড়ও নেই, এদের রয়েছে সরল চোখ।

পতঙ্গদের শরীর তিনভাগে বিভক্ত মাথা, বুক ও পেট। পতঙ্গদের আছে ডানা, শুঁড় এবং পুঞ্জাক্ষি। পৃথিবীর সর্বত্র মরুভূমিতে মেরুপ্রদেশে পাহাড় শৃঙ্গে, জলা জায়গায়, মাটি গর্ভে, ঠান্ডা গরম সব আবহাওয়ায় পোকাদের রয়েছে স্বচ্ছন্দ অবস্থান। একমাত্র সমুদ্রের তলদেশে কোনও পোকামাকড়ের হদিশ মেলেনি।

পতঙ্গবিদদের অনুমান প্রতি বর্গমাইল ভূমিতে পতঙ্গের সংখ্যা পৃথিবীর বর্তমান মোট জনসংখ্যার থেকে বেশি।

সমুদ্রের নোনা জল পতঙ্গরা সহ্য করতে পারে না। তাই সমুদ্রের জলে এদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়নি। একেবারে ধার এলাকায় বা সমুদ্রের খাঁড়ি এলাকায় অল্পস্বল্প দেখা যায়।

পতঙ্গদের শরীরের শক্ত খোলার ভিতরে বাতাস মজুত রাখার ব্যবস্থা আছে। এ থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নিয়ে ৩০ মিটার গভীর পর্যন্ত এখানে তারা স্বচ্ছন্দ দীর্ঘক্ষণ কাটাতে সক্ষম।

মশা জলে ডিম পাড়ে। এদের লাভা স্বচ্ছন্দে জলে এঁকে বেঁকে নড়াচড়া করে। শিশু ড্রাগনফ্লাই-মাছিরা সম্পূর্ণ বড় হওয়ার আগ পর্যন্ত জলে কাটায়। জলমাছি পোকারা পিছনের পা বৈঠার মতো ব্যবহার করে জলে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়।

অনেক প্রজাতির উইপোকা, পিঁপড়ে ও বোলতার চাকে (কলোনী) এত ব্যস্ততা থাকে যে বহিরাগত অন্য পোকামাকড়রা স্বচ্ছন্দে এর মধ্যে মিশে গিয়ে বিনা ঝামেলায় খাওয়া থাকার সুখ ভোগ করে।

মরুভূমির শুষ্ক পরিবেশকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য পোকাদের বাইরের কঠিন আবরণ তৈরি হয় কাইটিন নামের এক শক্ত পদার্থের দ্বারা। এর ভেতরে জলীয় বাষ্প আটকে রেখে এরা জলের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। শ্বাস কার্যের সময় এরা জল নিষ্ক্রমণে সতর্ক থাকে। খাদ্যের সঙ্গে যেটুকু জল মেলে তাতেও অনেকের চলে যায়।

ডিম থেকে বাচ্চা বেরোনোর ক্ষেত্রে এরা পরিবেশকে সুন্দর ভাবে ব্যবহার করে। কোনো কারণে বৃষ্টি আসতে দেরি করলে ডিম ফুটে লার্ভা বেরোয় না। খুব ঠান্ডা পড়লে, চারদিক বরফে ঢাকা, ওরাও ঘাপটি মেরে ডিমের মধ্যেই কাটিয়ে দেয়। এভাবে জীবনচক্রকে ওরা যথেষ্ঠ দক্ষতায় নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। মানুষ না অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীরা এই কাজে অক্ষম।

পৃথিবীর প্রথম উড়ন্ত প্রাণী হোল পতঙ্গ। খাদ্যের সন্ধানে, আত্মরক্ষার সুবিধায় ওড়ার অভ্যাস আয়ত্ত করেছে। একেবারে প্রথম আদি যুগের পোকাদের ডানা ছিল না। সে সময় তারা গাছে হড়কে চলা শুরু করে শরীরের চ্যাটালো অংশকে ব্যবহার করে। এ থেকেই কালক্রমে ডানার আবির্ভাব। বুকের অংশে শক্তিশালী পেশী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ওড়ার সাহায্য করার জন্য। পাখাগুলিকে অতি দ্রুত উপর নিচ করে কাঁপিয়ে স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়ায়।

শুঁড়কে এরা পুষ্পরস পান করার জন্য নল হিসাবে ব্যবহার করে। এটি দুটি ভাগে চেরা। স্বচ্ছন্দে জুড়ে গিয়ে নলে পরিণত হয়। আবার দরকার না পড়লে গুটিয়ে জড়ো করে এমনভাবে রাখে যে সহজে দেখা যায় না।

বেশির ভাগ পতঙ্গের শোনার ক্ষমতা আছে। লম্বা শুঁড়ওয়ালা ঘাসফড়িংদের শ্রবন যন্ত্র থাকে সামনের পায়ে। অন্যদের পেটের কাছে।

কিছু পতঙ্গ শব্দ উৎপাদনে সক্ষম (যেমন ঝিঁঝি পোকা)। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়িয়ে এরা শব্দ করে। ডানার কম্পনেও শব্দ উৎপন্ন হয়। এটা তারা করে নিজেদের অবস্থান জানাতে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে বার্তা পাঠাতে এবং বন্ধুদের আকৃষ্ট করার জন্য।

পিঁপড়ে আর উইদের মধ্যে লক্ষণীয় তফাৎ — ১) পিঁপড়ের শুঁড় হাতের কনুইয়ের মতো বাঁকানো, উইদের কাটা তারের টুকরো অংশ গোছের। ২) পিঁপড়ের যৌগিক পুঞ্জাক্ষি (চোখ) আছে, উইদের চোখ নেই। ৩) পিঁপড়ের পেটের শেষ দিকটা সরু হয়ে গেছে; উইয়ের পেটের গড়ন গোলাকার ভোঁতা গোছের। ৪) খাদ্যের বিচারে পিঁপড়ে মাংসাশা, উইয়ের খাদ্য উদ্ভিদ—অবশেষ। উই উদ্ভিদ বা বাড়ির বই/আসবাবপত্রের প্রভূত ক্ষতি করে। ৫) পিঁপড়ের জীবনচক্রে চারটি দশাই আছে; কিন্তু উইদের জীবনচক্রে পিউপা অবস্থা নেই। প্রাণীজগতে পিঁপড়েরা স্থান পেয়েছে হাইমেম্পটেরা বর্গে; কিন্তু উই আছে আইসোটপটেরা বর্গে। উইদের সাদা-পিঁপড়ে বলা হয়ে থাকে; কিন্তু বৈশিষ্ট্যে এরা আরশোলার কাছাকাছি পিঁপড়ের তুলনায়।

— লেখকঃ দীপক কুমার দাঁ, মোঃ ৯৪৭৪১৯২৭৯৯
গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ।

মৃত্যুঞ্জয় গুহ প্রসাদ

5 পাতার পর

পাঠক গোষ্ঠী তৈরি না হওয়ায় বাংলার অনেক যশস্বী বিজ্ঞান লেখক মৃত্যুর পরই হারিয়ে যান। আজ অবধি জগদানন্দ রায় ছাড়াআর কোনও বিজ্ঞান লেখকের রচনাবলি প্রকাশিত হয়নি। আমাদের একমাত্র চাওয়া তাঁর সৃষ্টি যেন অমরত্ব পায়। লেখা বেঁচে থাকে পাঠকের হৃদয়ে। তিনি বেঁচে থাকুন তাঁর সৃষ্টি সাম্রাজ্যের বিস্তৃত পরিসরে। তাঁকে প্রণাম...।

— লেখকঃ দীপক কুমার দাঁ, মোঃ ৯৪৭৪১৯২৭৯৯
গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ।

ডায়াবেটিস মেলাইটাস

4 পাতার পর

দেব। তাই প্রথম থেকেই সচেতন থাকলে ডায়াবেটিস রোগটি প্রতিরোধ সম্ভব। যাদের নিকট সম্পর্কে ডায়াবেটিস আছে, এমন স্কুল পড়ুয়াদের উপর নজরদারী, কাউনসেলিং ও শিক্ষা রোগটির প্রতিরোধে সাহায্য করবে। রোগের প্রাথমিক উপসর্গ দেখা দিলেই রক্ত পরীক্ষা করান। সঠিক রোগটি একবার ধরা পড়লে দৈনন্দিন সমস্যাগুলি নিজে বুঝতে শেখা ও প্রয়োজনে ইনসুলিন ওষুধ ও ডায়াবেটিসের উপযোগী খাদ্য সম্বন্ধে ধারণা থাকা আবশ্যিক।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। দীর্ঘস্থায়ী কার্যকরী ইনসুলিনের ব্যবহার, 'ইনহেলার ইনসুলিন' বা 'ওরাল ইনসুলিন' (হেক্সিল ইনসুলিন মনোমনো কনজুগেট-২) নিয়ে গবেষণা চলছে। মানব কোষের যাবতীয় জিনের নিউক্লিওটাইড অনুক্রম সম্পর্কিত তথ্য (Human Genome) আবিষ্কৃত হওয়ায় ডায়াবেটিস রোগীর জিনের ধরণ দেখে তাকে সঠিক ওষুধ দিয়ে রোগ সারানোর কথা ভাবা হচ্ছে। অত্যাধুনিক ব্যয় বহুল এই চিকিৎসা প্রকরণের নাম ফারমাকোজিনোমিক্স। এছাড়াও অগ্নাশয়ের বিটা কোষের ইনসুলিন নিঃসরণের কাজটির জন্য আরও এক অনুজৈবিক ও জিন তাত্ত্বিক পদ্ধতি (Therapeutic Cloning) প্রয়োগ করার চিন্তাও বর্তমানে করা হচ্ছে। তবুও স্বীকার করতে হবে এই মুহূর্তে ডায়াবেটিস সারানোর চাবি কাঠি চিকিৎসকের হাতে নেই। তাই প্রতিরোধ গড়ে তোলাই হবে শ্রেয়।

১৯৯১ সাল থেকে ১৪ই নভেম্বর ইনসুলিনের আবিষ্কারক নোবেল জয়ী ফ্রেডরিক ব্যান্টিয়ের জন্মদিনটি বিশ্বডায়াবেটিস দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। আর্ন্তজাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশনের সঙ্গে ভারতীয় ডায়াবেটিস এসোসিয়েশানের চিকিৎসক ও গবেষকরা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকারের। তবে মানুষের সচেতনতা ও সহযোগিতাই শেষ কথা।

—ইরা ঘোষ, ফোনঃ (০৩৩) ২৪৮৪২৮৯৭/৯৭৪৮১০১২৯১
১/৫ পূর্বাচল ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা-৭০০০৭৮

চিঠি

শ্রদ্ধেয় মহাশয় নমস্কার নেবেন। বিজ্ঞান অন্বেষক ডাকে পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানবেন। জানি না, কীভাবে আমার ঠিকানা পেয়েছেন।

পত্রিকাটি ছোটো হলেও বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসায় অনেক বড় কাজ করছে। এর প্রত্যেকটি লেখাই সচেতন পাঠককে ভাবাবে। কানন কুমার প্রামানিক মহাশয়ের বিকল্প দুধের সন্ধান পড়ে ভালো লাগল। শুনেছি এখন দুধের বদলে কৃত্রিম দুধের ছানা মিষ্টির দোকান আলো করে থাকে তাই মিষ্টি খেতে ভয় করে। কাননবাবুর ভাবনা আমাদের ভাবাচ্ছে। জলের ভবিষ্যৎ আর পিঁপড়ের রহস্য দুটি লেখাই আকর্ষণীয়। সূর্যের বুকে গতিশীল শুক্র নিয়ে বিশ্ব তোলপাড় হলেও আমরা গ্রামের মানুষ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখে কাটিয়েছি। নমস্কারান্তে—ড. প্রবাল কান্তি হাজরা পোঃ- দেউলপোতা-কেশবচক, ভায়া কলাগাছিয়া, খেজুরি, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১৪৩২

রিপোর্ট

আলোচনা ও প্রদর্শনী : পরিবেশ পত্রিকা (উত্তর পত্র) প্রকাশ

২২ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাবের পরিচালনায় ২২ সেপ্টেম্বর ক্লাবের কার্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পরিচয় পর্বের পর বিজ্ঞান গবেষক ও লেখক দীপক কুমার দাঁ রাজ্যের বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। শ্রী দাঁ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জানান সর্বত্র পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে, জলাভূমি ভরাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই বিজ্ঞানকর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে। জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক রাজা রাউত বলেন উত্তরবঙ্গে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে ভাবা উচিত। আলোচনাসভায় জলপাইগুড়ি ও কোচ বিহার জেলায় বিজ্ঞান কর্মীরা উপস্থিত থাকেন।

২য় পর্যায়ে চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মী বিবর্তন ভট্টাচার্য সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। তিনি বিভিন্ন তথ্য সহ আলোচনা করেন এবং প্রতিটি হাসপাতালে অ্যান্টিভেনিন সিরাম ইনজেকশন সহ সাপের কামড়ের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার দাবী করেন। সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত সাপে কামড়ালে কি করবেন ফোল্ডার সকলের কাছে প্রচার করেন।

৩য় পর্যায়ে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের সম্পাদক ও বিজ্ঞানকর্মী জয়দেব দে 'পরমাণু চুল্লি নয়, বিকল্প শক্তি চাই'' শীর্ষক পোস্টার সহ আলোচনা করেন। বক্তা পরমাণুচুল্লির বিপদ, দূর্ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করে বলেন সারা ভারতে মাত্র ২-৩ শতাংশ বিদ্যুৎ পাওয়া যায় পরমাণুচুল্লি থেকে অথচ বিকল্প ও নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎসগুলি কাজে লাগানো দরকার, পাশাপাশি পরমাণুচুল্লি পরিবেশের পক্ষে বিপদনজক, বছরের পর বছর ধরে তেজস্ক্রিয়তা পরিবেশে মেশে, ফলে জীবজগতে নানা রকম দুরারোগ্য রোগ বেড়ে যায়। বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রদর্শনী ও আলোচনাসভা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

২৩ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি হিমালয়ান নেচার এন্ড অ্যাড্ভেনচার ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় 'উত্তরপত্র' পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকার ২ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। উত্তরবঙ্গের বন, বন্যপ্রাণ ও পরিবেশ নিয়ে প্রায় ১৬টি প্রবন্ধ সহ পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন তুহিন শুভ্রমন্ডল। পত্রিকাটি প্রকাশ করেন পরিবেশ কর্মী অনিমেষ বোস। পরিবেশ কর্মীরা আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

পিঁপড়ের নানা কথা

2 পাতার পর

অসুবিধা না হয়, ঠিক সময়ে খাবার পায়, সেসব দিকে থাকে সতর্ক দৃষ্টি। বাচ্চা পিঁপড়েরা বড় হয়ে যাতে বাসার কাজটা সুষ্ঠভাবে করতে পারে সেজন্য তাদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষকের কাজটা সাধারণত বয়স্ক পিঁপড়েরা করে থাকে। ব্রিটেনের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল জীব বিজ্ঞানী সম্প্রতি সে দেশের দক্ষিণ উপকূলে 'টেমনোথোরাক্স আলবিপেনিস' প্রজাতির পিঁপড়ের উপর গবেষণা চালিয়ে এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। শিক্ষার্থী পিঁপড়েরা শিক্ষকের নির্দেশ তাদের দেহ মাথার শুঁড় দিয়ে পূর্ণ করে বুঝে নেয়।

শেষের কথা

পিঁপড়ে সম্পর্কে অনেক কথা বলা হল। আর দু-চারটি কথা বলেই আমার প্রবন্ধ শেষ করব। পিঁপড়ের ক্ষুদে শরীরে মাথাটা কত বড় হতে পারে? নিশ্চয়ই খুব বড় নয়? ওই ক্ষুদে মাথায় যে মগজ থাকে তাতে প্রায় দুলক্ষ পঞ্চাশ হাজারের মত কোষ থাকে। পিঁপড়েদের মধ্যে নালশো পিঁপড়েরাই বাইরের উত্তেজনায় সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। সব পিঁপড়েরই বিষ আছে। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার বুলেট এবং অস্ট্রেলিয়ার জ্যাক জাম্পার পিঁপড়েদের কামড় সবচেয়ে মারাত্মক। এদের বিষে ফর্মিক অ্যাসিডের মাত্রা খুব বেশি থাকে। পিঁপড়ে পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞানকে ফারমিকোলজি বলা হয়। পৃথিবীতে পিঁপড়েরও অনেক শত্রু আছে। পিঁপড়ে বা ওদের ডিম খায় এমন অনেক প্রাণী আছে। পিঁপড়ে খাওয়ার ব্যাপারে মানুষও পিছিয়ে নেই। তাইল্যান্ড, কলম্বিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং মেক্সিকো দেশের খাদ্য তালিকায় পিঁপড়ে এবং পিঁপড়ের ডিমের অনেক মুখরোচক পদ দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ায় এক ধরণের সবুজ রংয়ের পিঁপড়ে পাওয়া যায়। সে দেশের উপজাতিদের মধ্যে এই পিঁপড়ে পাওয়া যায়। সে দেশের উপজাতিদের মধ্যে এই পিঁপড়ে খাওয়ার রেওয়াজ আছে।

যেকোনও পরিবেশের সঙ্গে পিঁপড়েদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অসাধারণ। এখনকার দূষিত পরিবেশের সঙ্গেও এরা দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে। এই অসাধারণ ক্ষমতার জোরেই এরা আট কোটি বছরেরও বেশি সময় ধরে পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বুদ্ধিমান জীব হয়েও মানুষ কি পারবে অতদিন বেঁচে থাকতে। নিজেদের তৈরি দূষণের কবলে পড়ে হারিয়ে যাবে না তো?

— কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোঃ-৯৪৩৩১৪৫১১২
৩৭এ সেন্ট্রাল রোড, ফ্ল্যাট ৩এ, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২

এক নজরে
মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহর উল্লেখযোগ্য বইপত্র

১) পেট্রোলিয়াম—বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, বিশ্বভারতী- ০.৫০ টাঃ, ১৯৫৪
২) জড় ও শক্তি — বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ১৯৫৯, ১টাঃ
৩) আকাশ ও পৃথিবী—রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার, ১৯৬৪, শৈব্যা
৪) বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা—ইউনেসকো পুরস্কার, ১৯৬৯
৫) চলো যাই চাঁদের দেশে — শিশু সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, ১৯৭০
৬) জ্ঞানের আলো জ্বালালো যারা—৩ টাঃ ৯৪ পৃঃ
৭) বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ৪৫ টাঃ, ১৯৭৭
৮) জীবের ক্রম বিকাশ—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ২০০ টাঃ, ১৯৭৭
৯) বরণীয় বিজ্ঞানী স্মরণীয় আবিষ্কার—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ৪০ টাঃ, ১৯৮৪
১০) জীব জগতের বিচিত্র খবর ১ম —শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ১৫০ টাঃ, ১৯৯৯
১১) জীব জগতের বিচিত্র খবর ২য় —শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ১৮০ টাঃ, ২০০১
১২) আদিম পৃথিবীর প্রাণীদের কথা—শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং, ৩০ টাঃ, ১৯৯২
১৩) দেখে শেখো—প্রকাশক মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ, ১৯৮৬, ৬ টাঃ
১৪) সব নেশাই কি ক্ষতিকর—জ্ঞান বিচিত্রা ২০০৯, ৫০টাঃ
১৫) সাবধান, জীবাণুরা নিকটেই আছে—জ্ঞান বিচিত্রা ২০০৬, ১০০টাঃ
১৬) আলোর ঝর্ণা—ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন হাউস, ২০০৫, ১৫০টাঃ
১৭) সাগর - প্রাণীদের কথা—ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন হাউস, ২০০৬, ১০০টাঃ
১৮) জাতীয় ফুল ফল ও পশু পাখী ও খাদ্যশস্য—জ্ঞান বিচিত্রা ২০০৮, ৩০টাঃ
১৯) জলের রূপ কথা (সহ লেখক শৈবাল কুমার গুহ) পুনশ্চ ১৯৮৯, ২০ টাঃ
২০) স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কথা (সহ লেখক শৈবাল কুমার গুহ)—ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন হাউস, ২০১০, ২০০টাঃ

—সংকলক, দীপক কুমার দাঁ

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩
সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)
E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in